Embassy of the United States of America
Dhaka, Bangladesh
Public Affairs Section

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ড্যান রোজেনব্লুমের "যুক্তরাষ্ট্র ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল" শীর্ষক বক্তব্য

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)
ঢাকা, মঙ্গলবার, ৩০শে জানুয়ারি, ২০১৮

মেজর জেনারেল রহমানকে ধন্যবাদ আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজকে ধন্যবাদ জানাই আজকের এই বক্তৃতা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী একটি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বলার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। এবং এই সুযোগটি ঢাকায় হওয়ায় আমি সম্মানিত। অনেক বিষয়ে আমাদের দেশ দুটির একইরকম স্বার্থ ও মূল্যবোধ রয়েছে – এবং আমি বিশ্বাস করি এই বৃহত্তর অঞ্চল নিয়েও আমাদের একইরকম দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

সত্যি বলতে, এই বিষয়ে আমি অতি সম্প্রতি অনুধাবন করতে শুরু করেছি কেননা আমি সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে শুরু করেছি। বাংলাদেশে এটি আমার প্রথম সফর। গত জানুয়ারিতে আমি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর আঞ্চলিক বিষয়াবলীর দায়িত্ব গ্রহণ করি। আপনাদের দেশ, আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও এই অঞ্চলে বাংলাদেশের স্বার্থ সম্পর্কে যতটা সম্ভব জানতে এই সপ্তাহে আমি এখানে এসেছি। এখানে আসার পথে আমি আমাদের রাজনীতি বিষয়ক আন্ডারসেক্রেটারি টমাস শ্যানন প্রদত্ত একটি বক্তৃতা পড়েছি যেটি তিনি এই প্রতিষ্ঠানেই ঠিক প্রায় দুই বছর আগে প্রদান করেছিলেন। এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমার ঢাকায় অবস্থানের এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমি যা দেখেছি এবং শুনেছি তা আন্ডারসেক্রেটারি

শ্যাননের বক্তব্যকেই সমর্থন করেঃ "আমাদের দুই জাতি মিলে একই লক্ষ্যে কাজ করছে এমন একটি বাংলাদেশের জন্য যা অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ।"

আজকের বক্তব্যে আমি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল সম্পর্কে আলোকপাত করব। সম্ভবত আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, সেক্রেটারি টিলারসনসহ আমাদের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ প্রদত্ত বক্তৃতায় এবং ডিসেম্বরে প্রকাশিত জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলেও এই অঞ্চলের উল্লেখ আছে। কিন্তু আমি মনে করি আমার সঙ্গে আপনারা একমত হবেন যে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে যে কৌশল এবং এটি বাস্তবায়নে পদক্ষেপগুলোর ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার বিষয়ে জানার প্রচুর কৌতুহল রয়েছে।

আমি শুরু করতে চাই এটি বলে যে, একটি ইন্দো-প্যাসিফিক জাতি হিসেবে আমাদের কাছে এ অঞ্চলের সাফল্য কোন বিমূর্ত ধারণা নয় বরং এ বিষয়ে আমরা খুবই যত্নশীল। এবং আমি জানি বাংলাদেশও, যে দেশটি দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সন্ধিস্থলে কৌশলগতভাবে অবস্থিত, এ বিষয়ে অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

প্রসঙ্গগত, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল বলতে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে বুঝি। বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশী জনসংখ্যা ও অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করে এই অঞ্চল। যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী বাণিজ্য অংশীদার। আমাদের বেসরকারি খাতের কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে এবং বিশ্বব্যাংক ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সর্ববৃহৎ অথবা সহ-সর্ববৃহৎ স্বতন্ত্র শেয়ারহোল্ডার হিসেবে ভূমিকা রাখার ফলে যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলের অন্যতম এবং দাতা ও বিনিয়োগকারীও। নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘতম সমুদ্রসীমা রয়েছে এবং বেশ কয়েকটি দীর্ঘ মেয়াদী মৈত্রী-জোটের সাথে চুক্তি রয়েছে। এই অঞ্চলে আমাদের রয়েছে বিশ্বের অন্যতম অত্যাধুনিক নৌ ইউনিট, প্যাসিফিক ফ্লিট,

যেটি এই অঞ্চলের সমমনা দেশগুলোর সঙ্গে অসংখ্য যৌথ মহড়া করেছে এবং প্রায় প্রতিটি দেশের সামরিক বাহিনীর জন্য প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে। সংক্ষেপে, এই অঞ্চলের একটি অংশ হিসেবে এর প্রতি আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এর সাফল্যের পেছনে আমাদের বড় অংশীদারিত্ব রয়েছে।

গত কয়েক দশকে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লাখো মানুষকে দারিদ্র থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণির উন্নয়নে সহায়তা করেছে। বাংলাদেশ এই অঞ্চলের একটি দুর্দান্ত সফলতার গল্প, গত দশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে ছয় শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হার অর্জন করে নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এই অঞ্চল জঙ্গীবাদ মোকাবেলা এবং ভারত সাগর থেকে দক্ষিণ চীন সাগর পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে নৌচালনার স্বাধীনতা এবং বৈশ্বিক নিয়ম মেনে চলার ক্ষেত্রে বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে আমরা বাংলাদেশের সাথে আমাদের নিরাপত্তা অংশীদারিত্বের কদর করি এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা বাহিনীতে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলোর অন্যতম হিসেবে অবদান রেখে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য হাংলাদেশের অবহাঙ্কে আমরা উচ্চ পর্যায়ে মূল্যায়ন করি।

এই দ্রুত প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও, আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্য এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তুলনায় পিছিয়ে আছে। শতাব্দীকাল ধরে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল পণ্য, জনগণ এবং মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে একত্র হয়ে ছিল। কিন্তু আজ এটি পৃথিবীতে অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে কম সমন্বিত অঞ্চলের একটি। আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বিশ্ব বাণিজ্যের চার থেকে পাঁচ শতাংশে থেমে আছে। আসিয়ানের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় সেখানে আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্যে বিশ্ব বাণিজ্যর ২৫ শতাংশ। বিশ্ব ব্যাংক পরিমাপ করে দেখেছে যে বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে ও শুল্ক ব্যবস্থা কার্যকরী করে, দক্ষিণ এশিয়ার আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রায় চারগুণে উন্নয়ন সম্ভব যা বর্তমানের ২৮ বিলিয়ন ডলার থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি হতে

পারে। বৃহত্তর আঞ্চলিক যোগাযোগ এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক (সফট ইনফ্রাস্ট্রাকচার) ও অবকাঠামোগতভাবে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে পারত বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশের তিন শতাংশেরও কম রপ্তানি ভারতে এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে পৌঁছায়।

তাহলে আমরা কি করবো বলে ঠিক করেছি? প্রথমত, আমরা চিহ্নিত করেছি যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক পূর্বশর্ত হচ্ছে আইনের শাসনবিধি ও মৌলিক আন্তর্জাতিক নিয়মের জন্য আঞ্চলিক প্রতিশ্রুতি। আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অর্থপূর্ণ, আইন-ভিত্তিক আচরণবিধি দেশগুলোকে তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা, অধিক হারে বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সমুদ্রপথ উন্মুক্ত রাখা দুর্যোগের সময় দ্রুত সাড়া দেয়ার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি নিরাপদ এবং স্থায়ী আঞ্চলিক পরিবেশ স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে যা মানুষকে দারিদ্র থেকে বের করে এনে মধ্যবিত্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। পার্মানেন্ট কোর্ট অফ আর্বিট্রেশন ট্রাইবুনালে দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে ২০১৬ সালের রায় দু'পক্ষকেই মেনে নিতে হবে; আমরা দু'পক্ষকেই উৎসাহ দিতে চাই আইনানুযায়ী সমুদ্রসীমা বিরোধ সমাধান করতে। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি আদর্শ: ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইবুনাল ফর দ্য ল' অফ দ্য সী এর ২০১২ সালের মার্চ মাসে দেয়া বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রাসীমা বিরোধের সিদ্ধান্ত এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধের বন্ধুত্বপূর্ণ সমঝোতা প্রমাণ করে যে আন্তর্জাতিক আইন মেনে কিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা যায়।

তাই যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্রসীমার স্বাধীনতার জন্য এবং আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী আঞ্চলিক ও সমুদ্রসীমা বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য প্রতিশ্রুতি আরো দৃঢ় করবে। এবং আমরা আমাদের এই চেষ্টায় অন্যদের সহযোগিতা চাইব।

আমাদের আঞ্চলিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে, আমরা জোট এবং অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় আমাদের প্রতিশ্রুতি দ্বিগুণ করতে চাই, পাশাপাশি নতুন অংশীদারদের সাথে সম্পর্ক বিস্তার ও গভীর

করতে চাই যারা সার্বভৌম, ন্যায্য ও পারস্পারিক বাণিজ্য, এবং আইনের শাসনকে সম্মান করে। আমরা আমাদের দীর্ঘস্থায়ী সামরিক সম্পর্ক দৃঢ় করবো এবং আমাদের মিত্র ও অংশীদারদের সাথে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে উৎসাহিত করব।

ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল এর আরেকটি প্রধান লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক সংযোগ বিস্তার করা। এই সংযোগের ক্ষেত্রে অবকাঠামো একটি জটিল সমস্যা। সঠিক সেতু, রাস্তা, বিমান এবং সামুদ্রিক বন্দর ছাড়া যেকোন দেশের জন্য সম্পূর্ন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অর্জন প্রায় অসম্ভব, সমগ্র অঞ্চলের কথা বাদই দিলাম। অবকাঠামোকে বাস্তবিক অর্থে রূপান্তরিত করতে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মান এবং নিয়ম বজায় রাখতে হবে, স্থায়ীভাবে অর্থায়ন করতে হবে, এবং স্বাগতিক দেশকে নির্মানকার্য তত্ত্বাবধান এবং সার্বভৌমত্ব বজায় রাখাতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে সরকারী উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো। সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা হল, সেক্রেটারি টিলারসন যা উল্লেখ করেছেন, "প্রিডেটর ইকনমিক্স" বা "শিকারি অর্থনীতি" এর বিরুদ্ধে রক্ষা চাবি।

বাংলাদেশ ও অন্যান্য ইন্দো-প্যাসিফিক মহাসাগরীয় অঞ্চলের চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি হলো এই অপরিহার্য অবকাঠামো সংস্কারের ব্যয়হুলতা এবং তাৎক্ষণিক কম টেকসই ফলাফলের জন্য নিম্ন মূল্যে বাণিজ্যের প্রলোভন। যখন যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য উচ্চমানের নির্মাতারা একটি প্রকল্পের দিকে অগ্রসর হয় তখন তারা শুধুমাত্র তৎক্ষনাত খরচের দিকে তাকায় না, এর সাথে প্রকল্পের সমগ্র জীবনকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত খরচগুলোও তারা বিবেচনা করেন। ঋন গ্রহণ অথবা এমনকি শুধুমাত্র এ ব্যাপারটি যে জীবনকালের খরচসহ অর্থসংকলন মেনে নেয়া নিশ্চিত করে যে এখানে কোন অজানা খরচ নেই অথবা একটি সম্ভাব্য রূপান্তরিত প্রকল্প জনগণের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর না। অবকাঠামো অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে যখন স্বাগতিক দেশ তার উল্লেখযোগ্য নিম্নমানের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের জন্য অঙ্গীকার করে।

ক্রয়ের অনুরোধগুলোকে ভাল আকার এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রকল্পগুলোকে কার্যকরভাবে মূল্যায়নে দেশগুলোকে সাহায্য করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র অনুদান দিয়ে থাকে বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচীর মাধ্যমে যেমন কমার্শিয়াল ল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সিএলডিপি) এবং অন্যান্য অনুদান প্রোগ্রাম।

নভেম্বরে সিএলডিপির একটি দল বাংলাদেশে আসে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করা প্রসঙ্গে নীতিমালা নিয়ে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করার জন্য এবং বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের নীতিমালা তৈরি করতে সাহায্য করার জন্য যেন তাদের নীতিমালাগুলো এনার্জি অবকাঠামোতে রূপান্তর হতে পারে। সম্প্রতি ইউএসএইড তাদের ট্রেড ফেসিলিটেট প্রকল্পের মাধমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং কাস্টমসকে নতুন কাস্টমস ওয়েব পোর্টাল তৈরি করার জন্য সহযোগিতা করেছে। এই কার্যকর ওয়েবসাইট হল ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা ভেঙ্গে ফেলা এবং বাংলাদেশের ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগ্যানাইজেশনের অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য একটি বড় পদক্ষেপ। এর সাথে, ইউ.এস. ট্রেড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট সরাসরি সম্ভাব্যতা অধ্যয়নের জন্য অনুদান দিয়ে থাকে যা অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলোর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং কিভাবে এগুলোকে সম্ভাব্য সবচেয়ে গুনগতমান সম্পন্ন করে তৈরি করা যায় তা যাচাই করে। বিদেশে আমাদের দূতাবাসের কর্মকর্তাদের কাজ ব্যবসা এবং বিনিয়োগের জন্য পরিবেশ বৃদ্ধিতে গুরুত্ব নিশ্চিত করে। দূর্নীতি, ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব, এবং অসংগত অথবা বৈষম্যমূলক আইন এর কারণে যুক্তরাষ্ট্রের এবং অন্যান্য সহযোগিতা পূর্ণমাত্রায় পাওয়ার জন্য দেশগুলো বঞ্চিত হয়ে থাকে।

অংশীদার দেশগুলোর মধ্যে স্বচ্ছতা প্রসারে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী সংস্থা মিলিনিয়াম চ্যালেঞ্জ কর্পোরেশন (এমসিসি) যে সব দেশ গণতান্ত্রিক অধিকারের নির্দ্দিষ্ট মান মেনে চলে এবং দুর্নীতি

প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয় তাদের উন্নয়নে সহায়তা করে। এমসিসি'র এ অঞ্চলে গুরত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মকান্ড বৃদ্ধি দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধির পরিচায়ক।

আমরা জাপান, ভারত, অস্ট্রেলিয়ার মত সম-মানসিকতার অন্যান্য দেশের সাথে যারা এ অঞ্চলের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার প্রসারে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট তাদের সাথে গভীর অংশীদারিত্ব তৈরির দিকগুলো নিয়ে অনুসন্ধান করছি। যতই আমরা সামুদ্রিক এলাকা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, সাইবারসিকিউরিটি, এবং মানবিক সহায়তা, দুর্যোগ ত্রাণ, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমন্বয় করব ততই তা ইন্দো-প্যাসিফিক জাতিদের জন্য সুফল বয়ে আনবে। আমরা যদি সকলের উন্নয়ন ও সুযোগ তৈরিতে এই বিশাল অঞ্চলকে এক সাথে জড়িত করতে চাই তাহলে অনেক অংশীদারদের জোরালো প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

মহান বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলেছেন যে আপনি কেবল পানির কাছে দাঁড়িয়ে বা তাকিয়ে থেকে সমুদ্র পাড়ি দিতে পারেন না।

ইন্দো-প্যাসিফিকের শক্তি এর জনগণ, সরকার, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সবসময়ের জন্যই ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়া বা বৃহত্তর অঞ্চলের যে কোন দেশের সাথে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ যারা ইন্দো-প্যাসিফিকের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে আমাদের লক্ষ্যের সাথে একমত যেখানে সার্বভৌমত্ব রক্ষা পায় এবং আইন-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে সম্মান করা হয়। আমরা বাংলাদেশ এবং অন্যান্য সম-মানসিকতার দেশগুলোর সাথে কাজ করতে আগ্রহী যারা সমৃদ্ধশালী, নিরাপদ, এবং একটি আন্ত-যোগাযোগের ক্ষেত্রে সন্নিহিত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল তৈরিতে আমাদের লক্ষ্যের ব্যাপারে একমত।

জিআর/২০১৮
**বক্তৃতার জন্য*